



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 991 - 999

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

উপনিবেশ-পূর্ব বাংলার ইসলাম এবং ‘পুরাণ-কোরাণ’ সাহিত্য প্রকল্প

শ্রেয়সী মল্লিক

গবেষক

ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID : mallickshreyasi123@gmail.com

Received Date 20. 12. 2024

Selection Date 01. 02. 2025

Keyword

Pre-Colonial,
Bengal,
Loukik Islam,
Puran, Koran,
Literary
Project.

Abstract

The remarkable spread of Islam in Bengal was not an isolated phenomenon. It was intricately linked to the region's history, culture, societal dynamics, and socio-economic conditions. In pre-colonial Bengal, an alternative form of Islam, known as Folk Islam, gained immense popularity as opposed to strict Shariatic Islam. This paper seeks to explore the significant role of Islamic Bengali literature in the proliferation of this popular form of Islam in Bengal. Through the present study, we aim to analyze a notable literary initiative undertaken by Muslim poets of Bengal, which contributed significantly to the local understanding and acceptance of Islam during the pre-colonial period. By delving into these literary creations, we hope to shed light on how this distinct and localized version of Islam, deeply embedded in the cultural and spiritual fabric of Bengal, evolved and flourished. This exploration not only highlights the syncretic traditions that shaped Bengal's Islamic identity but also underscores the vital influence of regional literary expressions in bridging religious, cultural, and social divides. The paper, therefore, attempts to provide a comprehensive perspective on the interplay between literature and religion in shaping the unique trajectory of Islam in pre-colonial Bengal.

Discussion

১

অষ্টম শতাব্দীতে মূলত ধনসম্পদ লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে সিন্ধু প্রদেশ প্রথম আরবদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। পরবর্তীতে নেমে আসে তুর্কি ও তুর্কো আফগানদের আক্রমণ, যার পুরোধা ছিলেন গজনির সুলতান মামুদ। তবে পূর্বতন আরব আক্রমণ থেকে এদের মূলগত পার্থক্য ছিল এই যে, অর্থনৈতিক শোষণ ছাড়াও আরবরা বিজিত অঞ্চলে নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতির আধিপত্য আরোপ করতে চেয়েছিল এবং শাসিত অঞ্চলের কিছু ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উপাদানকে নিজেদের যাপনের অঙ্গীভূত করেছিল। তুর্কিরা অন্তত প্রাথমিকভাবে ভারতবর্ষের সঙ্গে কোনওরকম সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের পরিসর গড়ে তুলতে

আগ্রহী হয়নি। কিন্তু এই প্রাথমিক বিচ্ছিন্নতা ক্রমশ মিশ্রণের রূপ নিয়েছে। ভারতবর্ষ ব্যতীত মুসলিম অধিগৃহীত বা উপনিবেশিত অন্যান্য দেশ ইসলাম সংস্কৃতির মূল ধারার মধ্যেই অঙ্গীভূত হয়ে গেলেও একমাত্র ভারতবর্ষেই মুসলিমরা যেমন নিজেদের সংস্কৃতি বিস্তার করেছে তেমনি ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে উপাদান গ্রহণও করেছে। এই পারস্পরিকতা বা সহিষ্ণুতা সুফি মতাদর্শের অনুকূল ছিল।^১ এই মিথস্ক্রিয়াই এদেশকে ইসলামি সংস্কৃতির রাষ্ট্রে পরিণত হতে দেয় নি, সমন্বিত সংস্কৃতির শাস্ত্রত ঐতিহ্য বজায় রাখার সুযোগ দিয়েছে।

প্রসঙ্গত ভারতে ইসলামিভবন সংক্রান্ত প্রচলিত তত্ত্বগুলি সম্পর্কে রিচার্ড ইটনের বিশ্লেষণী আলোচনাটির দিকে আলোকপাত করা যেতে পারে। প্রথমত অভিভাসন তত্ত্ব, যার মূল বক্তব্য হল ভারতীয় মুসলমানদের সিংহভাগ বহিরাগত মুসলমানদের বংশোদ্ভূত। ইটনের মতে এই তত্ত্বটি ইরাণ মালভূমি এবং আরব সাগরের সঙ্গে ভৌগোলিকভাবে যুক্ত দক্ষিণ এশিয়ার কিছু অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও ভারতবর্ষের ব্যাপক ইসলামিভবন এর দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাবে না। দ্বিতীয় একটি জনপ্রিয় তত্ত্ব হল তরবারি তত্ত্ব। এক হাতে তলোয়ার এবং অন্য হাতে কোরাণ নিয়ে মুসলিম যোদ্ধারা ইসলামকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, ক্রুসেডের আমল থেকেই ইউরোপীয়রা এ কথা প্রচার করে এসেছে এবং উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক আমলে প্রাচ্যবাদ বা Orientalism এই বক্তব্যকে আরও জোরালো করেছে। এই তত্ত্বানুসারে সেই সকল অঞ্চলেই ইসলামিভবন বেশি হওয়া উচিত ছিল যেখানে দীর্ঘকাল মুসলিম সাম্রাজ্য বজায় থেকেছে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সেখানেই ইসলামিভবন বেশি দেখা গেছে, যেমন পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাঞ্জাব যা ছিল ইন্দো-মুসলিম শাসনের সীমানায়, যেখানে মুসলিম তলোয়ার ছিল সবচেয়ে দুর্বল। সমগ্র উপমহাদেশে মুসলিমদের রাজনৈতিক অনুপ্রবেশের মাত্রা এবং ইসলামিকরণের মাত্রার মধ্যে একটি ব্যস্তানুপাতের সম্পর্ক রয়েছে। অথও বঙ্গের ক্ষেত্রেও এই সূত্রটি খাটে, ভারতের ১৯০১ সালের আদমশুমারি অনুসারে পূর্বাঞ্চলীয় মুসলিম জেলাগুলির মধ্যে মুহম্মদ শাসকদের সদর দফতর হিসাবে বিখ্যাত স্থানগুলির কোনটি নেই। ঢাকা প্রায় একশত বছর ধরে নবাবের বাসস্থান ছিল, তবে ফরিদপুর ব্যতীত আশেপাশের যেকোনো জেলার তুলনায় এতে মুসলমানদের সংখ্যা কম। মালদা এবং মুর্শিদাবাদে পুরোনো রাজধানী রয়েছে, যেগুলি প্রায় সাড়ে চার শতাব্দী ধরে মুসলিম শাসনের কেন্দ্র ছিল, তবুও সেখানে মুসলমানরা দিনাজপুর, রাজশাহী এবং নদীয়ার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির তুলনায় জনসংখ্যার ন্যূন অনুপাত তৈরি করে। ইসলামিভবনের তৃতীয় শক্তিশালী তত্ত্বটিকে ইটন পৃষ্ঠপোষণা তত্ত্ব বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। মুসলিম শাসকের দরবারে নিজেদের উচ্চ রাজপদ কায়ম রাখা, কর থেকে ত্রাণ লাভ ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা ভোগের জন্য অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। পাশ্চাত্যের স্যেকুলার সমাজ বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বটিকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর আদমশুমারি অনুসারে, উত্তর ভারতের অনেক জমিদার পরিবার রাজস্ব পরিশোধ না করার জন্য কারাদণ্ড থেকে বাঁচতে বা পৈতৃক জমি রক্ষার জন্য নিজেদেরকে মুসলিম ঘোষণা করেছিলেন। তত্ত্বটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েও ইটন বলেছেন এই তত্ত্বের একমাত্র সীমাবদ্ধতা হল এই যে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার প্রাপ্তি থাকা পাঞ্জাব বা বাংলার মতো অঞ্চলের বিপুল ধর্মান্তরণের যুক্তি এর দ্বারা বোঝা যায় না। এ প্রসঙ্গে চতুর্থ তত্ত্বটি হল সামাজিক মুক্তি তত্ত্ব। নিম্নবর্ণের হিন্দু বা বৌদ্ধ, যারা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অত্যাচারে অস্তিত্বের ন্যূনতম মর্যাদাটুকুও হারিয়ে ফেলেছিল, ইসলামের সামাজিক সাম্য বা মনুষ্যত্বের প্রতি বৃহত্তর শ্রদ্ধার জায়গাটি তাদের আকর্ষণ করে। ইটন আলোকপাত করেছেন, প্রাক-আধুনিক মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা তাদের ধর্মের সামাজিক সাম্যের আদর্শকে হিন্দু অসমতার বিপরীতে জোর দেননি, বরং হিন্দু বহুদেবতার বিপরীতে ইসলামিক একেশ্বরবাদের উপর জোর দেন। অর্থাৎ, এই দুটি সভ্যতার তুলনা করার জন্য তাদের রেফারেন্স ছিল ধর্মতাত্ত্বিক, সামাজিক নয়। প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম সামাজিক সমতাকে (ধর্মীয় সাম্যের বিপরীতে) উৎসাহিত করে এই ধারণাটি ঊনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম সংস্কারকদের মধ্যে ফরাসি বিপ্লবের উত্তরাধিকার থেকে এসেছে। তাছাড়া এমন প্রমাণও অলভ্য নয় যেখানে ইসলামিভবন সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসে নিম্নবর্ণীয় মানুষের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে। এটি বাংলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্য। বাংলায় ইসলাম বিস্তারের ক্ষেত্রে নগরায়ণ এবং নাগরিক অর্থনীতির বিন্যাসকে ইটন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন যা বাঙালি মুসলমানদের জাতি কাঠামোকেও একটা স্পষ্ট চেহারা দিয়েছিল। এই জাতিকাঠামোর মধ্যেও এক ধরনের হায়ারার্কি গড়ে উঠেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ধর্মান্তরণের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে জাতিব্যবস্থা অস্বীকার করে নয়, ধর্মান্তরিতদের সঙ্গে তাঁদের জাতির সংযোগ বজায় রেখে। বৃহত্তর ভারতীয়

উপমহাদেশে ক্ষেত্রে ইসলামিভবনের প্রচলিত তত্ত্বগুলিকে পুনর্বিবেচনা করার পর ইটন তাঁর আলোচনাকে সীমায়িত করেছেন বঙ্গদেশে। এক মন্তুর সামাজিক প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক সহাবস্থানের মধ্য দিয়েই বাংলায় এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল বলে ইটনের মত।^২

বাংলার স্থানীয় ইসলামকে সমালোচক জগদীশ নারায়ণ সরকার ‘লোকপ্রিয় ইসলাম’ নামে চিনতে চেয়েছেন।^৩ মমতাজুর রহমানও তাঁর গবেষণায় মধ্যকালীন বঙ্গীয় মুসলমান জনজীবনে ইসলামের অনাড়ম্বর ও কঠোর সংযমী চরিত্র দেখতে পাননি।^৪ সমসাময়িক সাহিত্য পর্যবেক্ষণ করে তাঁর মনে হয়েছে ধর্মীয় মতবাদ ও বিশ্বাসের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কহীন একধরনের লৌকিক ইসলামই তখন প্রচলিত ছিল। বস্তুত ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বাংলা ভাষায় ইসলামীয় ধর্মকাব্য রচনার কারণ বা কৈফিয়ত হিসেবে প্রায় প্রত্যেক বাঙালি মুসলমান কবি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁদের কৈফিয়ত থেকে জানা যায় বাংলা ভাষায় ইসলামীয় শাস্ত্রকর্মের নির্দেশ সম্বলিত রচনার অভাবে ইসলাম ধর্মের মৌলিক আচার বিশ্বাসের সঙ্গে প্রায় অপরিচিত এক বাঙালি মুসলমান সমাজ সেসময় অস্তিত্বশীল ছিল। এই আদি বাঙালি মুসলিম লেখকগোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় আরবি-ফারসি ভাষায় অজ্ঞ বাঙালি মুসলিম জনসমাজের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের অবলম্বন স্বরূপ এক সমন্বয়ধর্মী ইসলামি ঐতিহ্য সৃষ্টি হয় যা উনিশ শতকে পাশ্চাত্য অভিঘাত জনিত বিভিন্ন শক্তির প্রভাবে বিপর্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।^৫ সমালোচকদের পূর্বপাঠগুলিকে স্মরণে রেখে মিশ্র সংস্কৃতির এই ঐতিহ্যের জায়গা থেকে আমরা বুঝতে চেষ্টা করব একটি সাহিত্যিক প্রকল্পকে যা বাংলার মানুষকে ধীরে ধীরে ইসলামের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।

২

বলপূর্বক ধর্মান্তরণের মাধ্যমে মানুষকে হয়ত ধর্মীয় পরিচয়টা দেওয়া যায়, কিন্তু ধর্মীয় আবেগ নয়। ধর্ম মানুষের এক গূঢ় অন্তর্নিহিত প্রবণতা। ধর্মীয় আবেগ না থাকলে মধ্যযুগে এবং মধ্যযুগের প্রান্তে এসে বাংলায় এত বিপুল ইসলামিক সংস্কৃতি তৈরি হতে পারত না। মধ্যযুগে কোরাণ ও হাদিস বাংলায় অনুদিত হয়নি, কারণ আলেমরা বাংলাকে পবিত্র ভাষা বলে মনে করতেন না। কোনও কোনও মসজিদে শরিয়ত নির্ভর মৌখিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল এবং মসজিদের পশ্চিম দেওয়ালেও অনেক সময় কোরাণের আয়াত লেখা থাকত যা মসজিদের ক্যালিগ্রাফিক ডিজাইনকে প্রতিফলিত করত। কিন্তু প্রায়োগিক লিখিত চর্চার অভাবে এই ধর্মীয় শিক্ষা জনপরিসরে প্রসার লাভ করেনি। ফলত ইসলাম ধর্মের মূল ধারণাগুলিকে প্রচার করার জন্য এক বিকল্প পথের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। মধ্যযুগে ইসলামের যাবতীয় ধর্মতত্ত্ব ও কাহিনি রচিত হয়েছে বাংলায়। পুঁথির রচয়িতারা সমাজকে স্থায়ী ধর্মে অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসী হয়েছিলেন আরবি ও ফারসি ভাষায় রচিত ইসলামি শাস্ত্র গ্রন্থগুলির বাংলা তর্জমা করেন। তাঁদের মতে সমস্যা ছিল দ্বিবিধ। একদিকে বাঙালি সমাজের আরবি ও ফারসি ভাষায় অজ্ঞতা এবং অন্যদিকে ধর্মের পবিত্র বাণী ‘ইতর’ হিন্দু ভাষায় লেখার বিষয়ে গোঁড়া মুসলমানদের কঠোর বিরোধিতা। এই ধর্মীয় আপত্তির আড়ালে বঙ্গদেশে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভেতরকার এক গভীর সামাজিক সাংস্কৃতিক বিভেদ কাজ করেছিল। এই সম্প্রদায় বহিরাগত এবং স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলিম - এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল এবং সাধারণভাবে আশরাফ ও আজলাফ নামে পরিচিত ছিল। শুদ্ধতা ও সামাজিক সম্মানের নিরিখে আশরাফ শ্রেণি ছিল মুসলিম সমাজে সম্মানের শিখরে। অনেকক্ষেত্রে উত্তরভারতের মুসলমান বঙ্গে উচ্চ সম্মানের অধিকার দাবি করেছে। আশরাফদের সাংস্কৃতিক চেতনা ও দৃষ্টি ছিল পশ্চিমাভিমুখী। আশরাফদের সাংস্কৃতিক মানসের পবিত্রতার মানদণ্ডে ইসলামীয় ধর্মচেতনার বাহক হিসেবে বাংলাভাষা ছিল নিতান্ত অযোগ্য।^৬ কিছু সুলতান ও আমীর বাংলাভাষায় সাহিত্য চর্চায় উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু তাঁদের সমর্থন পেয়েছে হিন্দু ধর্মসাহিত্য, ইসলামীয় ধর্মশাস্ত্র নয়।

আশরাফ ও আজলাফ সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবেই ষোড়শ শতকে এক বাঙালি মুসলিম লেখকগোষ্ঠীর উদ্ভব যাঁরা বাংলাভাষায় প্রথম ইসলামি সাহিত্য রচনা করার সঙ্গে সঙ্গে সমন্বয়ধর্মী বঙ্গীয় ইসলামের ঐতিহ্য-ধারাও সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় আবেগ প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে। এই আবেগের বশবর্তী হয়েই কিছু মানুষ সাহিত্য শুনতে শুরু করেছেন এবং এভাবে গড়ে উঠেছে এক সাহিত্য সমাজ। অনুবাদ ও অনুকৃতির



মাধ্যমে ইসলামের মূল তত্ত্বগুলি মধ্যযুগে বাংলায় প্রসার লাভ করেছে। এর বর্গভেদ আছে, কালিক ও আঞ্চলিক ভেদ রয়েছে এবং তা উদ্দিষ্ট শ্রোতার জ্ঞানসীমা ও সামাজিকতার উপর নির্ভর করেছে সবসময়ই। এই সাহিত্য সমাজ গড়ে তুলতে সুফিরা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। লেখকদের মধ্যে অনেকেই মরমিয়া-পন্থী পীর বা পীরের শিষ্য হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। ভাষা সমস্যার চেয়েও এঁদের কাছে কঠিনতর সমস্যা ছিল বাঙালির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে ইসলামের রূপ-কল্প, বিশ্বাস ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা। পালাপার্বণ, নাট্য, গীত, আখ্যান ও উপাখ্যানময় বাঙালির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করার পক্ষে ইসলামের সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর রূপ অনুকূল ছিল না। বাংলার লোকসমাজে ইসলামের গৌরব-প্রমাণ সূক্ষ্ম ও নীরস তাত্ত্বিক বিচারে নয়, ইসলামীয় আখ্যান ও উপাখ্যানের নায়ক-নায়িকার অতুলনীয় বীর্য ও মহত্ব প্রচারের মধ্যেই সম্ভবপর ছিল। একারণেই আরবি ফারসি গ্রন্থভুক্ত মুসলিম নায়ক-নায়িকাদের বঙ্গের লোকচেতনায় উপস্থাপন করার গভীর আবশ্যিকতা ছিল। বাঙালি জনগণের পরিচিত ভাষায় ও রূপে ইসলামীয় ঐতিহ্যধারাকে নতুন ছাঁচে ঢেলে লেখার ক্ষেত্রে, সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জনমনে ইসলাম ধর্মের প্রতি আবেগ সঞ্চারের ক্ষেত্রে কবিরা এক বিশেষ সাহিত্যিক প্রকল্প অবলম্বন করেছিলেন। কাব্যগুলি ইসলাম ধর্ম বিষয়ক হলেও কাব্যের কাঠামো বা অবয়ব বাংলা আঞ্চলিক ও মাগীয় রীতি অনুসারী। বাঙালি পাঠকের পরিচিত ধর্মীয় বলয়ের মধ্যেই অপরিচিত শব্দ এবং তত্ত্ব ক্রমশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একটি তুল্য-মূল্য পদ্ধতিতে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ধর্মচর্চার প্রসার ঘটেছে যা ‘পুরাণ-কোরাণ’ সাহিত্য প্রকল্প নামে পরিচিত।

আমরা সিরাত ও প্রণয়োপাখ্যান-এই দুটি সাহিত্যবর্গ থেকে উদাহরণ নির্বাচন করে উক্ত ‘পুরাণ-কোরাণ’ প্রকল্পটি অনুধাবনের চেষ্টা করব। কাব্য থেকে আমরা মূলত দেখার চেষ্টা করব -

ক. ভাষার সংগঠন এবং বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক।

খ. ভাষা কোন সামাজিক অবস্থান থেকে উঠে আসছে, মাগীয় না লোকজ।

গ. ভাষা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে শ্রোতার চরিত্র বোঝা সম্ভব কি না।

ঘ. কাব্যে যে উপমা, রূপক অলংকার ব্যবহৃত হয়েছে তা মূল আরবি বা ফার্সি কাব্যে থাকা সম্ভব কি না, যদি থাকে তবে বাংলা ভাষায় তা কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তা যদি উৎস কাব্যে না থাকে তবে নতুন উপমা, রূপকের ব্যবহার হল কেন।

৩

সিরাত হল ইসলামের পবিত্র চরিত্র, বিশেষত পয়গম্বরদের (মহম্মদ ও অন্যান্য নবী) জীবনী। এর দুটো অংশ - মহম্মদ পূর্ববর্তী সকল নবীদের জীবন কাহিনি এবং মহম্মদের জীবন কাহিনি। একটি সিরাত সম্পর্কে আলোচনা করে ‘পুরাণ-কোরাণ’ প্রকল্পটি দেখা যেতে পারে।

সৈয়দ সুলতানের ‘নবীবংশ’ : চট্টগ্রামের সুফি ভাবাপন্ন কবি সৈয়দ সুলতানের ‘নবীবংশ’ কাব্যটি ষোড়শ শতকের রচনা। চট্টগ্রামে দীর্ঘ মুসলিম উপনিবেশের ঐতিহ্য রয়েছে। বাংলায় মুসলিম আক্রমণের আগে থেকেই এখানে সমুদ্রগামী বণিক-প্রচারক আরবরা ঘাঁটি করেছিল। পাপ হতে পারে এমন সম্ভাবনা সত্ত্বেও কবি দেবভাষা আরবিতে নিবদ্ধ কাহিনিকে বাংলায় রূপান্তরিত করেছিলেন, কারণ তিনি জানেন বঙ্গদেশবাসী আরবি ভাষা বিষয়ে অজ্ঞ। কাব্য নাম থেকেই বোঝা যায় ইসলাম ধর্ম-প্রচারকের জীবন-চরিত ও কাফের দলন কাহিনিকে ঢেলে সাজানো হয়েছে হরিবংশ-পাণ্ডববিজয়ের ছাঁচে। আল্লাকে কাব্যে ‘নিরঞ্জন’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে -

“আদমের বাক্য শুনি / নিরঞ্জে কহে পুনি/ সেই তত্ত্ব ত্রিভুবন সার।”^১

কবি জানেন বহু দেববাদ এবং ঈশ্বরের সাকার অস্তিত্বে বিশ্বাসী বাংলায় নির্গুণ, নিরাকার আল্লাহ তত্ত্ব প্রচার করা কঠিন। কাব্যে তাই ধর্ম-নিরঞ্জনের অনুশঙ্গে আল্লাকে ‘নিরঞ্জন’ বলা হচ্ছে, কারণ নিরঞ্জন শব্দটি নির্গুণ তত্ত্বের সবচেয়ে কাছাকাছি শব্দ। এমন শব্দ নির্বাচন করা হচ্ছে যা ইসলাম ধর্ম-তত্ত্বের সচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। তাছাড়া ‘নিরঞ্জন’ শব্দটির প্রয়োগ বৌদ্ধধর্মের স্মৃতিকেও সজাগ করে। বৌদ্ধ ধর্মচর্চাকে কেন্দ্র করে ভারত ও ইরানের মধ্যে একটা পরোক্ষ সংযোগ

তৈরি হয়েছিল বৌদ্ধ পরিব্রাজক এবং তাত্ত্বিক Ngan she-kao এর অনুবাদকর্মের সূত্রে। তাঁর অনুবাদের বিষয় ছিল আগম এবং অনুবাদের ভাষা ছিল সম্ভবত ভারতীয় প্রাকৃত বা কোনও ইরানীয় ভাষা। অন্যদিকে সম্রাট কনিষ্ক পরবর্তী জীবনে বৌদ্ধধর্মের প্রচারক ও পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর সাম্রাজ্য ব্যাক্ত্রিয়া, তুর্কিস্তান - এসব অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অনেক বৌদ্ধ লেখকের বিশ্লেষণে তিনি দ্বিতীয় অশোক। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে তাঁর এই অবদান বৌদ্ধধর্মকে ইরানীয় অঞ্চলে বিস্তৃতি দিতে অনেকটা সাহায্য করেছে। সুতরাং বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে পারস্যের পরিচয়ের একটা সুপ্রাচীন ঐতিহ্যই প্রমাণিত হচ্ছে।^৮

ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য কবি হিন্দুর প্রধান দেবতাদের নৈতিক বিচ্যুতি এবং অপবিত্র স্পর্শে ধর্মগ্রন্থ কলুষিত হওয়ার কাহিনির অবতারণা করেছেন -

“চারি মহাজন স্থানে পাইল চারি বেদ।/ সাম বেদ ব্রহ্মাত পাঠাইলা নৈরাকার।।/তবে যদি বিষুর হইল উৎপন।/ যজুর্বেদ তাহানে পাঠাইলা নিরঞ্জন।।/ তৃতীয় মহেশ যদি সৃজন হইল।/ ঋক বেদ তাহার স্থানে পাঠাইয়া দিল।।/ চতুর্থে যদি সে হরি হইলা সৃজন।/ অথর্ব বেদ তাহানে পাঠাইলা নিরঞ্জন।।”^৯

এখানে কবি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই নামক্রম মেনেছেন। এরপর বলা হল পরম যোগী শিব সুরাপান করে আত্মজ্ঞান ও ব্রতচ্যুত হলেন এবং বিষ্ণুও কামাসক্ত হয়ে পড়লেন। ইবলিস সেই সুযোগে বেদকে অপবিত্র করল এবং এভাবে ঐশ শাস্ত্র ‘চতুর্বেদ’ বাতিল হয়ে গেল সুতরাং ভারতীয়দের সত্যধর্মরূপে নির্বাচিত হতে পারে একমাত্র ইসলাম, বলা হল -

“এ চারি বেদত সাক্ষি দিচ্ছে করতার।/ অবশ্য অবশ্য মুহম্মদ ব্যক্ত হইবার।।”^{১০}

বহু দেববাদী সমাজে আল্লাহর ধারণা এমনভাবে দেওয়া হল যাতে মানুষ বহু দেববাদকে নস্যাৎ করে একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করে। বহু দেববাদের একধরনের সমালোচনা উঠে এসেছে এই অংশে। এমনকি দেববাদের আকর গ্রন্থ বেদ দ্বারা মহম্মদের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

সৈয়দ সুলতানের আলোচ্য কাব্যে বিশ্বসৃষ্টি তত্ত্ব, ইসলামের মূল তাত্ত্বিক বিষয়গুলি এবং অন্যান্য নবীসহ মহম্মদের জীবন বর্ণনায় যোগ তত্ত্বের প্রভাব দেখা যায়; যেমন - আদিমানব আদমের দেহ পরিচয় -

“অধঃ রেত শিবশক্তি লিঙ্গতে বহিল/ নাভিদেশে পঞ্চবারি একত্র হইল।।”^{১১}

লোক সাধারণের ধর্ম হিসেবেই সুফি ইসলামের মরমিয়া বিস্তার হয়ে উঠেছিল এবং এমতাবস্থায় খুবই স্বাভাবিক ছিল যোগ-তত্ত্ব ভিত্তিক সুফির একটা দেশজ অবয়ব গঠন। ইসলাম ধর্মে কী কী করা উচিত অর্থাৎ ফারজ এবং কী কী করলে নরকে যেতে হতে পারে (যেমন - “নামাজ না পড়ে যেবা রোজা না রাখয়ে”^{১২}), তার তালিকা তৈরি করা হচ্ছে কাব্যে। এই অংশ থেকে শ্রোতার চরিত্র বোঝা সম্ভব। তাঁদের কাছেই ইসলামি শাস্ত্র তত্ত্ব পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে যারা যোগশাস্ত্রে পারঙ্গম। এক্ষেত্রে আমাদের আঞ্চলিক ও সময়ের ভেদকে মাথায় রাখতে হবে। ষোড়শ শতকে চট্টগ্রাম এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র। সেখানে জ্ঞানচর্চা অনেক বেশি সংগঠিত। তার মানে এই নয় যে সারা বাংলা জুড়ে তখন ইসলামি ফারজের কথা প্রচারিত হচ্ছে।

জায়েনউদ্দিনের ‘রসুল বিজয়’ কাব্য : এ কাব্য রচনাকাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। একদল ঐতিহাসিকের মতে ষোড়শ শতকের তৃতীয় পাদে, অন্য দলের মতে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে কাব্যটি রচিত হয়েছে। ইসলামের প্রচার ও প্রসার উদ্দেশ্যে মহম্মদের যুদ্ধযাত্রাই এ কাব্যের উপজীব্য। এটি আরবি ‘মাগাজী’ জাতীয় যুদ্ধ কাব্য। এখানে ইরাকরাজ জয়কুমের সঙ্গে রসুলের লড়াই বর্ণিত হয়েছে। এ কাব্যে দেখা যায় অনুবাদ কীভাবে ভাষাসংস্কৃতি তৈরি করেছে। বলা হচ্ছে মহম্মদ ‘গাণ্ডীব’ নিয়ে যুদ্ধে যাচ্ছেন। মহম্মদকে হিন্দু করে তোলা কখনোই কবির উদ্দেশ্য নয়। ‘গাণ্ডীব’ এখানে হয়ে দাঁড়াচ্ছে ধনুকের প্রতিশব্দ। শ্রোতাদের জন্য যুদ্ধের চেনা অস্ত্র প্রসঙ্গ ব্যবহার করছেন কবি। বোঝা যায় যে কবি মহাভারতের বাংলা

অনুবাদের সঙ্গে পরিচিত এবং জানেন যে তাঁর শ্রোতাদেরও এ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা রয়েছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অপেক্ষাও যে রসুলের ধর্মযুদ্ধ বেশি মহিমাযজ্ঞক সেই বিষয়টি কৌশলে বর্ণনা করেছেন কবি -

“যদ্যপি থাকিত ভীম এ যুদ্ধ মাঝার।/ গদা তুলিল দেখি ধাইত সত্ত্বর।।/ কিবা কৃপাচার্য যে বিরাট
অভিমন্যু।/ সে সব এ যুদ্ধ দেখি পলাইত অরণ্য।।”^{১৩}

যুদ্ধদৃশ্যে দেখা যায় -

“ধানুকি ধানুকি যুদ্ধ অস্ত্র বরিষণ।/ বরিষার মেঘে যেন বরিষে সঘন।।”^{১৪}

এই উপমা ইরাক-ইরানের মরু আবহে উপযুক্ত হতে পারে না। কাব্যের ভৌগলিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক পরিবেশ সুনিশ্চিতভাবে বঙ্গীয়। চেনা ভাষা কাঠামোর মধ্যে ক্রমশ অচেনা তত্ত্ব পরিবেশনার মধ্য দিয়ে সিরাতগুলিতে এভাবেই মহম্মদ কেন্দ্রিক আবেগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

দৌলত উজীর বাহমাম খানের ‘লাইলী-মজনু’ কাব্য : ইসলামি প্রণয়োপাখ্যানের মধ্যে দৌলত উজীর বাহরাম খান রচিত ‘লাইলী-মজনু’ কাব্যটি আমাদের আলোচ্য। আহমদ শরীফের অনুমান অনুযায়ী ১৫৪৩-১৫৫৩ সালের মধ্যে এ কাব্যটি রচিত হয়েছিল। এ কাহিনি সুফিদের সৃষ্টি। ইরানই সুফি মতের বিকাশ ও প্রসার ক্ষেত্র। ফলত কাহিনির উদ্ভব হয় ইরানীয় ভাষাতেই। নিছক প্রেমকাব্য হিসেবে বাংলায় একে রচনা ও পঠন বিষয়ে আলেমদের নিষেধাজ্ঞা ছিল। সেদিক থেকে লাইলী-মজনুর লৌকিক প্রণয় কথা রচনা করে দৌলত উজীর দুঃসাহসিকতার গৌরব অর্জন করেছেন। ‘হামদ’ অংশে নিরাকার আল্লার ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে। ‘নাত’ অংশে রয়েছে সুফিমতের প্রেমজ সৃষ্টিতত্ত্ব -

“আকাশ পাতাল মর্ত্য এ তিন ভুবন/ যার প্রেম রস হস্তে হইছে সৃজন।”^{১৫}

কাব্যে আবু বকর, উমর, উসমান, আলীকে রসুলের ‘পরম চারি বন্ধু’ বলা হয়েছে, বোঝা যায় শিয়া-সুন্নি ভেদকে কবি প্রকট করতে চান না কাব্যে (এই চারজন খলিফা মহম্মদের বংশকে নয়, নির্বাচনকে সমর্থক করেছিলেন)। মরু আরবের কাহিনি হলেও এ কাব্যে আরবের আবহ অত্যন্ত কম। কেবল একবার শিবিরের কথা (লাইলী ‘শিবিরেত গমন করিলা মনোরঙ্গে’^{১৬}) এবং যৌতুক স্বরূপ উট দান ও উটের পিঠে চেপে লাইলীর সামদেশে গমন - এটুকুই কেবল আরবি অনুষ্ঙ্গ, আর সব বঙ্গদেশীয়। হিন্দু পুরাণের প্রতুল ব্যবহার রয়েছে কাব্যে। আরব দেশকে বৈকুণ্ঠের সঙ্গে তুলনা করেছেন কবি। হিন্দু পুরাণ অনুসারে পুত্র পুত্র নামক নরক থেকে পিতাকে পরিত্রাণ করে। সেকারণে পিতার মুখান্নি, শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান একমাত্র পুত্রের দ্বারাই করণীয়। এই ধারণা আত্মীকরণ করেই কবি বলছেন, -

“সংসারের সুখ আর পরলোক কর্ম।/ ধনপুত্র দুই যার সে বড় সৃজন্ম।।”^{১৭}

কএস তথা মজনুর বর্ণনা যেন সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের রসিক নাগরিকের বর্ণনা -

“কনক মুকুর জিনি ললাট সুন্দর।/ কামের কামান জিনি ভুরু যুগ টান।”^{১৮}

ব্যবহৃত অনুষ্ঙ্গগুলি সবই বঙ্গদেশের কাব্য শাস্ত্রীয় ও কাব্য হৃদয়তাসম্পন্ন। আরব বীরের বর্ণনা বলে মনেই হয় না। লাইলীর রূপ বর্ণনাতেও পৌরাণিক রূপসীদের তুলনা প্রসঙ্গ এসেছে -

“ইন্দ্রাণী রোহিণী রতি/ অহল্যা দ্রৌপদী সতী/ নহে তার রূপের সমান।”^{১৯}

ভারতীয় প্রেমশাপটে সুফির সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সংযোগ রচনা করেছে বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদ। রাধা কৃষ্ণের ভক্তি কেন্দ্রিক সাহিত্য এবং সুফি সাহিত্য উভয়েরই মূল ভাবনায় রয়েছে অপ্রাপ্তির অতলান্ত বেদনা, সযত্নে পোষিত বিচ্ছেদ। সুফি সাধকরাও দেবতাকে প্রিয় হিসেবে দেখেছেন, তাঁকে খুঁজেছেন সারাজীবন ধরে। এই বিচ্ছেদ যন্ত্রণা বোঝাতেই নর-নারীর

প্রেমের প্রতিতুলনা আনা হয়েছে। এই তত্ত্বই রূপকায়িত হয়েছে ‘লাইলী মজনু’ কাব্যে। মজনুর বিরহ দশা বর্ণনাকালে প্রেম সম্পর্কে কবি বলেন –

“ঘরে বড় জঞ্জাল বাহিরে গেলে দুখ/ পিরীতি করিলে জীবনে নাহি সুখ।”^{২০}

এ যেন চণ্ডীদাসের রাধার আক্ষেপোক্তি –

“সইকে বলে পিরীতি ভালো/ হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া/ কাঁদিতে জীবন গেল।”^{২১}

লাইলীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর মজনুর অবস্থা বর্ণনায় কবি বলেছেন, –

“ক্ষেণে হাসে ক্ষেণে কাঁদে না চিনে আপন।/ ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে বৈসে ক্ষেণে পাড়ে লড়।/ ক্ষেণে খায় পাছার ভূমিতে গুরুতর।।”^{২২}

মনে পড়ে যায় পূর্বরাগের রাধা বা প্রেমমোহিত চৈতন্যদেবের ছবি। যোগ তত্ত্বে বিশ্বাসী কবির কাব্যের নায়ককেও যোগ সাধনায় রত দেখা যায় –

“তপোবনে তাপসী জপয়ে প্রভু নাম/ মায়াজাল কাটিল বর্জিল ক্রোধ কাম।”^{২৩}

ভারতীয় নাথপন্থী যোগীদের সাধনা ও দর্শনের সঙ্গে সুফি মতবাদের একটা সংমিশ্রণের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল অনেক আগেই। আলবেরুনী তাঁর বইতে ভারতীয় যোগশাস্ত্রের সঙ্গে সুফি ভাবনার সাযুজ্যের উল্লেখ করেছেন।

কার্যত ভারতীয় পরিমণ্ডলে যে কোনও সাংস্কৃতিক অভিবর্তন (cultural synthesis) - এর ক্ষেত্রে যোগ, তন্ত্র এবং ভক্তি - এই তিনটি ধারার সংস্পর্শ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, সুফির ক্ষেত্রেও তা সত্য। পৌরাণিক অনুষ্ণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ত্রিপদী পয়ার ছন্দে সুফি ধর্মের মূল তত্ত্ব পেশ করেছেন কবি চেনা ছাঁচের জনপ্রিয় প্রেমকাহিনির রূপকে। বাঙালি শ্রোতার মনে আবেগের উদ্বেক ঘটাতে এই ‘পুরাণ-কোরাণ’ প্রকল্পটি বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

8

বাংলার প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্ব একমাত্রিক সময়, সংস্কৃতি বা ধর্মীয় উচ্চারণের পরিসর নয়। এই পর্বে বাংলায় ইসলামের প্রতিগ্রহণও বহুস্তরীয়। বাংলায় ইসলাম গ্রহণকারী কোনও সমরূপ জনগোষ্ঠী ছিল না। স্থানীয় মুসলমানদের একটা নিজস্ব নৃ-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল। এরা বৌদ্ধিক স্তরে মুসলমান হয়নি। দৈনন্দিন জীবনে এরা নিজেদের নৃ-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করেছে এবং ইসলামের কিছু সাংস্কৃতিক উপাদানকে গ্রহণ করেছে। এই সাংস্কৃতিক উপাদানের মধ্যে অন্যতম ছিল সাহিত্য। বাংলায় ইসলামের লোকপ্রিয়তার জায়গা থেকে এই সাহিত্যগুলি আঞ্চলিক শ্রোতৃবর্গের আবেগের পরিসরে স্থান পেয়েছিল। তুর্কি আক্রমণের পর বাংলায় বিধর্মীদের বিরুদ্ধে সমাজের একধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে পুরাণ ও মহাকাব্যের অনুবাদ শুরু হয়েছিল। বাঙালি তখন তাদের সাংস্কৃতিক নায়কের সন্ধান করছিল পুরাণ ও মহাকাব্যের জগতে। ফলত ইসলাম সমাজেও নবীদের জীবন-কথা পরিবেশনার একটা তাগিদ সৃষ্টি হয়েছিল সিরাত সাহিত্যের মাধ্যমে। তখন বাংলার বহুদেববাদী সমাজে অবতার বা সাধু-সন্তের চরিত্রের প্রতি যে সম্মানজনক অভিব্যক্তি ছিল সেই সমাজই ধীরে ধীরে ইসলামের পবিত্র চরিত্রদের গ্রহণ করেছে। এঁরা বঙ্গদেশের মননে স্থান পেয়েছেন। এমন চেনা ভাষা-কাঠামো এবং চেনা ধর্মীয় অনুষ্ণের মধ্য দিয়ে এঁদের পবিত্র জীবন কাহিনি পেশ করা হয়েছিল যে বাংলার মানুষ তাঁদের অন্য সমাজভুক্ত মনে করেনি। আলেমদের নিষেধবাণী সত্ত্বেও ইসলামি কাব্যগুলিতে মূল থেকে প্রতিসরণ ও প্রতিস্থাপনের রূপরেখা দেখা যায়। কাব্যে অবলম্বিত পৌরাণিক আবহের মধ্য দিয়েই কোরাণের আদর্শ স্থান পেতে শুরু করে বঙ্গীয় মানসে। সুকৌশলে কবিরা তুল্য-মূল্য মানদণ্ডে একেশ্বরবাদী ইসলাম ধর্ম, আল্লা ও রসুলের শ্রেষ্ঠত্বও প্রতিপাদন করেছেন কাব্যে, যা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। পুরাণের অনুষ্ণ ব্যবহার করেও নায়কত্বের বিকল্প ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কাব্যে। সিরাতগুলির মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন অনেক বেশি খুঁজে পাওয়া যায়।

অন্যদিকে ইসলামি প্রণয়োপাখ্যানগুলির মধ্যে বৈষ্ণব ভক্তিবাদ ও সুফি ভক্তিবাদের সহাবস্থানের পরিসর প্রশস্ত। এ বিষয়টি আরও প্রকট হয় সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম এবং তার পরবর্তী লোকায়ত পর্যায়গুলির সঙ্গে সুফির অন্তর্লীন যোগাযোগের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করলে। রাধা কৃষ্ণের ভক্তিবাদী চিন্তা সুফির মধ্যে অনুপ্রবেশের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন মীর আব্দুল ওয়াহিদ বিলগরামি তাঁর ‘হকায়িক ই হিন্দ’ গ্রন্থে। এখানে বিলগরামি কৃষ্ণ ও তৎকেন্দ্রিক অন্যান্য বিষয়গুলিকে সুফি ভাবনার রূপক হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই বইতেই ‘গীতগোবিন্দম্’ সম্পর্কে বিলগরামির বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন –

“(…) the love scenes and rhetorical graces of the poet are not to be understood in the sense that persons of civil minds are dispositions attached to them. Radhika the heroine is heavenly wisdom. The milkmaids, who divert Krishna from his allegiance to her, are the senses of smell, sight, touch, taste and hearing. Krishna represented as pursuing them is the human soul, which attaches itself to earthly pleasures. The return of Krishna to his first Love is the return of the repentant sinner to God, which give joy and heaven.”²⁸

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে সুফির চোখে শ্রীরাধা ধর্মীয় প্রজ্ঞা এবং শ্রীকৃষ্ণ মানবাত্মার পরম প্রকাশ। সুফির সমস্ত কাহিনিতেই সাধকের সাধনা মানে পুরুষের অভিযাত্রা। আমাদের আলোচ্য লাইলী-মজনুর কাহিনিতেও মজনুই কিন্তু লাইলীর দিকে ধাবিত হয়। বৌদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্যদের সাধনাতেও পুরুষই মুখ্যত অভিযাত্রী। ভারতে রাধাকৃষ্ণ ভক্তিবাদী ঘরানা নারীর অভিযাত্রাকে প্রধান করেছে। বৈষ্ণব সাধনা রাধার সাধনা, রাধার অভিযাত্রা। তাই রাধার মধ্যেই সুফি সাধক নিজেকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। এই তাত্ত্বিক এবং অনুভূতির সহাবস্থানের জায়গা থেকে ইসলামি প্রণয়োপাখ্যানগুলির মধ্যে ‘পুরাণ-কোরাণ’ প্রকল্পটি বিশেষ রূপ পেয়েছে।

সবশেষে বলা যায় বাংলায় প্রাথমিক পর্যায়ে সামাজিক ধর্মাস্তরণ এবং বহিরাগত ধর্ম ও স্থানীয় সংস্কৃতির যে বিরোধ ও ব্যবধান ছিল সেখানে বঙ্গীয় মুসলমানদের সাহিত্যচর্চায় ‘পুরাণ-কোরাণ’ প্রকল্পটি সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে সমন্বয় ও স্নাতন্ত্রের সার্থক রূপ পরিগ্রহণ করেছে। পরবর্তীতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বৃহত্তর সামাজিক, রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম সম্প্রদায়বোধ সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে এই সাহিত্যিক সমন্বয়বাদ কীভাবে ক্রমবিলুপ্ত হয়েছে সে প্রসঙ্গ একটি পৃথক আলোচনার দাবি রাখে।

Reference:

1. Das, Sisir kumar. *A History of Indian Literature, 500-1399 : From Courtly to the Popular*. New Delhi: Sahitya Academy. 2005. P. 221
2. Richard M. Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier 1204-1760*. University of California Press. 1996. Page. 58
3. সরকার, জগদীশ নারায়ণ. *বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক (মধ্য যুগ)*. কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ. ১৯১৪. পৃ. ৫
4. রহমান, মমতাজুর. *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*. ঢাকা : বাংলা একাডেমী. ১৯৮১. পৃ. ৭৪
5. রহমান, আর. হাবিব. (সম্পা.) *ইসলাম ও বাঙালি মুসলমান সমাজ*. অসীম রায়, কলকাতা : রেডিয়ান্স. ২০১৫. পৃ. ৬৩২
6. তদেব, পৃ. ৩৯
7. শরীফ, আহমদ. *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ সংস্কৃতির রূপ*. ঢাকা: সময় প্রকাশন. ২০০৪. পৃ. ১৮২
8. Bagchi, P.C. *Some Early Buddhist Missionaries at Persia in China*. The Calcutta Review. Third Series. Vol-XXIV. Kolkata : The University of Calcutta. July-September 1927. Page. 60 - 64
9. শরীফ, আহমদ. *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ সংস্কৃতির রূপ*, ঢাকা: সময় প্রকাশন. ২০০৪. পৃ. ১৮৩-১৮৪
10. তদেব. পৃ. ১৮৪
11. তদেব. পৃ. ১৮০

১২. তদেব. পৃ. ২০১
১৩. তদেব. পৃ. ২৩৪
১৪. তদেব. পৃ. ২৩৪
১৫. তদেব. পৃ. ২১৯
১৬. তদেব. পৃ. ২১৪
১৭. তদেব. পৃ. ২১৮
১৮. শরীফ, আহমেদ (সম্পা.) *দৌলত উজীর বাহরাম খান বিরচিত লাইলী মজনু*. ঢাকা : বাংলা একাডেমী. ১৩৯০. পৃ. ৮২
১৯. তদেব. পৃ. ৮৩
২০. তদেব. পৃ. ৩৪
২১. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা.) *বৈষ্ণব পদাবলী*. কলকাতা: সাহিত্য সংসদ. ১৯৫৮. পৃ. ৬৩
২২. শরীফ, আহমেদ (সম্পা.) *দৌলত উজীর বাহরাম খান বিরচিত লাইলী মজনু*. ঢাকা : বাংলা একাডেমী. ১৩৯০. পৃ. ৭৯
২৩. তদেব. পৃ. ৬৫
২৪. M.A. Macauliffe. *The Sikh Religion*. Vi. Oxford. 1909. Page. 10